G-J-3242

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

২০০১-২০০২

To
Central Library, V.U.

Vidyasaar University Geographical Association
Department of Geography & R.M.
V.U; Medinipur
721102

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মেদিনীপুর - ৭২১১০২

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

কর্মসমিতি (২০০১-২০০২)

প্রধান উপদেষ্টা :	অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য
সভাপতি :	অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন বিভাগ
সহ-সভাপতি :	অধ্যাপিকা সুমনা বন্দ্যোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক :	পারিজাত সরকার ও সৌমিত্র মণ্ডল
সাংস্কৃতিক সম্পাদকমণ্ডলী:	শুভ্রা জানা(মুখ্য),মৌমিতা মেটলা, মিঠু বেরা, শ্যামল দে, দীপক বিসাই, বনশ্রী হাজরা
কোষাধ্যক্ষমণ্ডলী :	বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় (মুখ্য),মানসী পাত্র, নরসিংহ দাস, ডালিয়া দস্তপাট
ক্রীড়া সম্পাদকমণ্ডলী :	দেবাশিস ঘোড়াই (মুখ্য), অমলেশ রাউত, শেখ নিজামুল হক, আসিক আহ্‌মেদ ।
পর্যটন সম্পাদকমণ্ডলী :	রঞ্জিত জানা (মুখ্য), মৌসুমী পাল, সন্দীপ মাইতি, দেবাশিস জানা, নবকুমার রায়, সুজাতা খামরই
উদ্যান পরিচর্যা বিভাগ :	বিশ্বজিৎ প্রামাণিক (মুখ্য), নন্দিতা দাস, সোমা সেনাপতি, বনানী কর, পীযুষ দাস, সমরেশ দে
সহায়ক মণ্ডলী :	দেবপ্রকাশ পাহাড়ী, উৎপল রায় ও পরিমল সরকার

প্রবাহ পত্রিকার পরিচালন সমিতি (২০০১-২০০২)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়

প্রধান সহায়ক : অধ্যাপক যোগেন্দ্রমোহন দেবনাথ ও অধ্যাপক ভূদেব রঞ্জন দে

প্রধান নিয়ামক : বিনয় কুমার চন্দ

প্রধান সম্পাদক : অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদকমণ্ডলী : অসিত পরিয়ারী, সুশান্ত আশ ও শুভ্রা জানা

সম্পাদকীয়

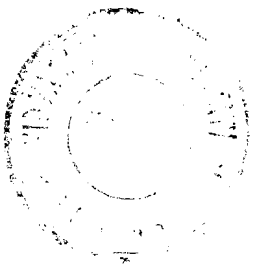

আমাদের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র প্রবাহ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল এবং একইসঙ্গে পত্রিকার বয়স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল। আমরা বিশ্বাস রাখি পরবর্তী বছরগুলিতেও অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আমাদের ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন বিভাগে দেওয়াল পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকবে। বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক প্রবন্ধ লেখায় অনুপ্রাণিত করাই এই পত্রিকা প্রকাশনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই নীতিকে সামনে রেখেই দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য রচনাগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। সঙ্গে বিগত সংখ্যার মতই অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের, কিছু রচনা সংযোজন করা হয়েছে। প্রথম সংখ্যার যেসব ত্রুটি ছিল তা সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। পরিবেশপ্রেমী পাঠকদের কাছে পত্রিকার এই সংখ্যাটি বিগত সংখ্যার মতই আদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে করব।

গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাদক
এবং
কার্যনির্বাহী সম্পাদকমণ্ডলীর
সদস্যবৃন্দ

মেদিনীপুর
১লা বৈশাখ ১৪০৯
১৫ই এপ্রিল, ২০০২

শোকপ্রস্তাব

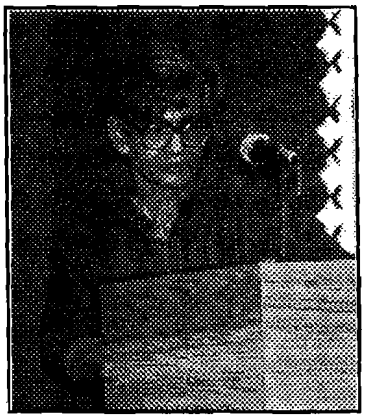

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় এবং এই ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন
বিভাগের একান্ত শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক ৺অরবিন্দ বিশ্বাসের
অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকসন্তপ্ত ।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন বিভাগ
তথা
জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের
সদস্যবৃন্দ

১লা বৈশাখ ১৪০৯
১৫ই এপ্রিল ২০০২

গোপীবল্লভপুরে ল্যাটেরাইট ভূমিক্ষয় শিল্পী- অরবিন্দ বিশ্বাস ২১.৮.২০০০

'চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই...'

সূচীপত্র

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যবিবরণী	১
দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনা-গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪
ক্যাম্পাসের ভূগোল- অভিজিত গুহ	৭
মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙন ও পরিবেশ বিপর্যয়-সমীর মাইতি, সুশান্ত কুমার আশ ও শুভ্রা জানা	৯
জলাভূমি সংরক্ষণ-পারিজাত সরকার	১৩
গঙ্গোত্রী নেই গঙ্গোত্রীতে-রুমা দাঁ	১৪
কোলাঘাটে রূপনারায়ণে ভাঙন:পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি মাত্রা-মৌমিতা মেটলা	১৬
বাতাস যদি বদলে যায়-অমলেশ রাউৎ	১৭
পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিবেশ রক্ষার সমস্যা-কল্লোল সরকার	১৮
কালের যাত্রার ধ্বনি-সুরঞ্জনা প্রধান	১৯
বর্তমান কৃষি বনাম পরিবেশ সমস্যা-সংগ্রাম সিং মণ্ডল	২০
পরিবেশ নির্ভর বাণিজ্য ও তার প্রতিক্রিয়া-সমীর মাইতি	২১
সভ্যতার বিকাশ ও পরিবেশ সমস্যা-ক্ষীরোদ ওরাং	২২
মাউন্ট এটনা-ডালিয়া দস্তপাট	২৩
মধ্যপ্রাচ্যের পরিবেশ সমস্যা-বর্ণালী চট্টোপাধ্যায়	২৪
যুদ্ধ ও পরিবেশ বিপর্যয়-সুশান্ত কুমার আশ	২৫

Published and Printed by Dr.Jogendramohan Debnath, Registrar, Vidyasagar University, Medinipur, 721102, W.B., India, at N.B.Laser Writer, R-19 Dakbungalow Road, Medinipur 721101, email: kgp_majeeb@sanchernet.in **Price-Rs.25.00**

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন
বার্ষিক কার্যবিবরণী (২০০১-২০০২)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বিগত একবছর বিশেষ ঘটনাবহুল। এর সামগ্রিক বিবরণী নিচে দেওয়া হল।

১. **পত্রিকা প্রকাশ :** অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসাবে প্রবাহ পত্রিকা (প্রথম সংখ্যা)বিভাগীয় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়ের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় সদস্যদের বিভিন্ন ভৌগোলিক রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত এটিই প্রথম পত্রিকা।

২. **বিদায় অভিনন্দন :** ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে 'ফিরে দেখা' নামক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভাগের বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের বিদায় অভিনন্দন জানান হয়।

৩. **নবীন বরণ :** ২০০১ শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগে আগত নবীন ছাত্রছাত্রীদের সম্মানে নবীনবরণ সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২০০১-এর ২৮শে নভেম্বর। উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথমবর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা চল্লিশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঁয়তাল্লিশে দাঁড়ায়।

৪. **পর্যটন ও পরিবেশ দর্শন :** অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আয়োজিত বার্ষিক পর্যটনের ব্যবস্থা করা হয় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে। বিভাগের প্রায় পঁয়ত্রিশজন ছাত্রছাত্রীদের পর্যটকদলটি বিভাগীয় কার্টোগ্রাফার শ্রী দেবপ্রকাশ পাহাড়ী ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রী উৎপল রায় এর তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে যাত্রা করে এবং দাক্ষিণাত্যের কোয়েম্বাটোর, উতকামন্দ, কোচিন, তিরুঅনন্তপুরম, কন্যাকুমারী, মাদুরাই, রামেশ্বরম, কোদাইক্যানাল, পণ্ডিচেরী ও চেন্নাই ভ্রমণ করে ৫ই জানুয়ারী ২০০২তারিখে ফিরে আসে। এই পর্যটনে ছাত্রছাত্রীদের দলনেতা ছিল শ্রী সৌমিত্র মণ্ডল।

৫. **দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ :** অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়াল পত্রিকা (২০০১-২০০২সংখ্যা) ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ডিসেম্বর (২০০১) মাসে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার সম্পাদিকা শুভ্রা জানা। বিভিন্ন বিভাগের প্রকাশিত পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এই পত্রিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভের সম্মান অর্জন করে।

৬. **পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠান :** আমাদের ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন বিভাগের প্রথম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালের ২৬ ও ২৭শে জানুয়ারী। এই উৎসবের সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় প্রধান এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বিভাগের কার্টোগ্রাফার শ্রী দেবপ্রকাশ পাহাড়ি। উৎসব অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সঙ্গীত, আবৃত্তি, গীতিআলেখ্য, নাটক

দক্ষিণভারতে
পরিবেশ পর্যটনের স্মৃতি

দক্ষিণভারতে
কোদাই ক্যানালের কাছে জলপ্রপাত

কেরালার বিখ্যাত কোভালাম সৈকত

ইত্যাদি মঞ্চস্থ হয় বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সমবেত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। দ্বিতীয় দিন শহরের বাইরে কাঁসাই নদীর তীরে মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে এক বনভোজনে সকলে যোগদান করে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে এক বিশেষ স্মারক পুস্তিকা 'ফিরে দেখা' প্রকাশিত হয়।

৭. **বিভাগীয় উদ্যান সংস্কার ঃ** ভূগোল ও পরিবেশে ব্যবস্থাপন বিভাগের উদ্যোগে বিভাগের অলিন্দে টবে রক্ষিত উদ্ভিদ-উদ্যানটির পূর্ণসংস্কার করা হয় এই বছর(২০০২)জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনের (NAAC) পরিদর্শনের আগে। অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যের উদ্যোগে এবং বিশেষত প্রথম বিভাগের ছাত্র শ্রী বিশ্বজিৎ প্রামাণিক-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় উদ্ভিদ উদ্যানটিকে একটি আকর্ষণীয় রূপ দান করে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়।

৮. **টুর্নামেন্ট ও ক্রীড়া ব্যবস্থা ঃ** বর্তমান শিক্ষাবর্ষে অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বিভাগের ছাত্ররা আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ক্রিকেট খেলায় দলের নেতৃত্ব দেয় দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র শ্রী দেবাশিষ ঘোড়াই এবং ভলিবল খেলায় নেতৃত্ব দেয় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী অমলেশ রাউত। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এই বিভাগের ছাত্ররা কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের (৮ উইকেটে ১৪৫ রান)বিরুদ্ধে ৩৫ রানে (১০ উইকেটে ১১৫ রান) পরাজিত হয়। বিভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাধিক রান করে শ্রী পারিজাত সরকার (৩৫রান)। এরপর ১২ই মার্চ তারিখে বিভাগীয় ছাত্ররা বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও শেষপর্যন্ত ২৩:২৫ ও ২৪:২৬ গেমে পরাজিত হয়।

১লা বৈশাখ ১৪০৯
১৫ই এপ্রিল ২০০২

সাংস্কৃতিক সম্পাদকমণ্ডলী

দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনা

গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
(বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন বিভাগ)

ভূমিকা : আধুনিক যুগে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সর্বাত্মকভাবে কাজে লাগিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে চলেছে বিভিন্ন দেশের ক্রমাগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা। এ বিষয়ে এখন পৃথিবীর দেশগুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী । বিগত ষাটের দশক পর্যন্ত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলি অনেক এগিয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায়। পরে, বিশেষভাবে সত্তরের দশক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্রুত এগিয়ে এসেছে । স্বনির্ভর উপগ্রহ-নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখন আমাদের দেশসহ আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশ উন্নত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী।

পরিবেশবিদদের মতে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এই আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর দ্রুত উন্নয়ন ব্যবস্থাই বিশেষ পরিবেশ সমস্যা ডেকে আনতে চলেছে, যা আগামী প্রজন্মকে বিপজ্জনক মাত্রায় দুষিত পরিবেশ উপহার দেবে । এর গুরুত্ব মনে রেখেই গত পঞ্চাশের দশক থেকে প্রায় সকল দেশের শাসনব্যবস্থায় একটি বিশেষ অংশ হিসেবে পরিবেশ দপ্তর খোলা হয়েছে এবং দেশের বিভিন্নস্থানে যান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকরী করার আগে এই দপ্তর থেকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনার পর প্রকল্পটিকে ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । আগামী প্রজন্মের মানুষ, তথা সমগ্র জীবজগতের সার্বিক স্বার্থরক্ষার কথা মনে রেখে আজকের দিনে ব্যবস্থা যে উন্নয়ন ব্যবস্থা আজকের দিনে গ্রহণযোগ্য তাকে বলা হয় স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন (Sustainable Development), অর্থাৎ আজকের মানুষ পরিবেশ থেকে যতটা গ্রহণ করবে ততটাই আবার তাকে পরিবেশের ভান্ডারে ফিরিয়ে দিতে হবে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে ।

পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনা কি ?

স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ব্যবস্থায় দেশের কোন অংশে আঞ্চলিক প্রকল্প গড়ে তোলার আগে এক বিশেষ পরিবেশ সমীক্ষা চালানো হয় — যার মূল উদ্দেশ্য হল এই যে ঐ প্রকল্পটি নির্ধারিত স্থানে গড়ে তোলা হলে পরিবেশের ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, এই প্রতিক্রিয়ার কতটা হবে পরিবেশের সহায়ক এবং কতটা সৃষ্টি করবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তা নির্ধারণ করা। এই সমীক্ষা ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনা (Environmental Impact Assessment)। বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি দেশে খনিজ আহোরণ ক্ষেত্র, শিল্পকারখানা নির্মাণ, শহর ও নগর বিন্যাস, বিমানঘাঁটি নির্মাণ ইত্যাদির আগে স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের ওপর বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং সর্বোপরি পর্যালোচনা করে দেখা হয় যে ঐ নির্মাণকার্যের ফলে পরিবেশের ওপর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কি

কি ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে এবং ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক বাস্তুসংস্থানেরই কতটা ক্ষতি হতে পারে।

পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনার বিভিন্ন দিক

পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনার তিনটি প্রাসঙ্গিক দিক হল —

ক) পরিবেশ-প্রভাব মূল্যায়ন, খ) পরিবেশ-প্রভাব বর্ণনা এবং গ) পরিবেশ সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

ক) পরিবেশ-প্রভাব মূল্যায়নের (Environment Impact Assessment) মাধ্যমে মূলত দেখা হয় কোন বিশেষ কর্মকান্ড কার্যকরী করার ফলে জৈব-প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে কি কি ও কতখানি ঋণাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে;

খ) পরিবেশ-প্রভাব বর্ণনা (Environment Impact Statement) একটি লিখিত তত্ত্ব যা জাতীয়, রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরের ভিত্তিতে লিখিত থাকে; এবং

গ) পরিবেশ সংক্রান্ত নির্দেশিকা (Environmental Inventory) হল কোন নির্দিষ্ট স্থানের, যেখানে কোন প্রকল্প অনুযায়ী কর্মকান্ড রূপায়িত হতে চলেছে, তার সামগ্রিক পরিবেশের বিবরণ।

পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৫০এর দশকে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানে প্রথম পর্যায়ে পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর ভিত্তিতে নির্দেশিকা প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সার্বজনীন সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা নিশ্চিত করা। এইসময় বিভিন্ন সংগঠন (যেমন — জলসরবরাহ কর্তৃপক্ষ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি)-এর কাছে পৃথক পৃথক তথ্য পাঠানো হয়; যদিও কোন সার্বিক তথ্য নির্দেশিকা তখন প্রস্তুত করা হয়নি। যেমন বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন পত্র তৈরি করা হয় তাতে পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধারাবাহিক বছরের বৃষ্টিপাতের সর্বাধিক প্রবণতা অনুযায়ী বাঁধটির পক্ষে অতিরিক্ত জলের চাপ সহ্য করার কতটা ক্ষমতা থাকা দরকার তার নির্দেশিকা ছিল। অনুরূপভাবে কলকারখানার ক্ষেত্রে বর্জ্য ধোঁয়া নিঃসরণের চিমনি কতটা উঁচু হলে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হবেনা এবং দূষণ সহনমাত্রার নিচে থাকবে তার বিধান দেওয়া হয়েছিল। এই তত্ত্বগুলিকে আবার উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের কাছে পেশ করা হয় বিচার-বিশ্লেষণের জন্য। পরমাণুশক্তি উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঐ কেন্দ্র নির্মাণের স্থানটি ও কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে Rachel Carson, Barbara Ward এবং Barry Commoner এর মত পরিবেশপ্রেমীদের নেতৃত্বে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্তরে দানা বেঁধে ওঠার ফলে দেশে দেশে রাজনৈতিক পর্যায়েও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। এইসব আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত অনেকটা সংগঠিত হওয়ার ফলেই বিভিন্ন

দেশে সরকারী স্তরে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে দেশের কোন অংশে পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বড় কোন শিল্প ইত্যাদি গড়ে তোলার আগে সরকারী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বেসরকারী বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন (NGO'S)- এরও মতামতও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ আইন (Environmental Legislation) রূপে National Environmental Policy Act (NEPA) কার্যকরী হয় ১৯৭০ সালে। এরপর কানাডাতে ১৯৭৩ সালে সরকারী উদ্যোগে Environmental Assessment and Review Process সংস্থা গঠিত হয়। এইসব উদ্যোগের প্রতিফলন হিসাবেই ক্রমশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ, কানাডা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের নানা দেশে পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৯৭৮ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী স্তরে পরিবেশ দপ্তর গঠন করেন।

১৯৭০এর দশকের শুরু থেকে পরিবেশ-প্রভাব পর্যালোচনায় (EIA) মূলত বায়ু, জল ও বর্জমন্ড (Solid Waste)-এর মান ও দুষণমাত্রা নির্ধারণের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হত। পরবর্তীকালে ক্রমশ এই কাজ জীবজগৎ ও বাস্তুতন্ত্রের দূষণমাত্রা নির্ধারণেও মনোযোগ দিতে থাকে। অতি সম্প্রতি মানুষের আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলের অবস্থা নির্ণায়ক হিসাবেও পরিবেশ প্রভাব পর্যালোচনা ব্যবস্থাকে (EIA System) যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে একবিংশ শতকের পৃথিবীতে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নির্ণায়ক ব্যবস্থা নীতিগতভাবে বিজ্ঞানী, স্থপতি, নাগরিকসমিতি ইত্যাদি সকলের কাছেই পরিপূর্ণমাত্রায় সমাদৃত হয়েছে।

ক্যাম্পাসের ভূগোল

অভিজিত গুহ
(বিভাগীয় প্রধান, নৃতত্ত্ব বিভাগ)

ভূগোলের সার্বিকতা

পৃথিবী,মহাদেশ, দেশ, অঞ্চলও জেলার যদি ভূগোল থাকতে পারে তাহলে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভূগোল থাকবে না কেন ? ভূগোল বলতে আমি অবশ্য এখানে শুধুই মানচিত্র অঙ্কন বোঝাচ্ছি না। ভূগোল মানে সবকিছুই । একটা জায়গার ভূগোলের মধ্যে সেখানকার মাটি, পাথর, জল, বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, গাছপালা, পশুপাখি, মানবগোষ্ঠী ও তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সবটাই জড়িয়ে থাকে । ভূগোল মানে একটা সার্বিক ব্যাপার। নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে ভূগোলের এ ব্যাপারে বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে । তবে নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রে থাকে মানুষ আর ভূগোলের কেন্দ্রে ভূ-প্রকৃতি । আসলে ভূ-প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তো আর কোন প্রাণী বা গাছপালার অস্তিত্ব ভাবা যায় না তাই ভূগোল শুধু সার্বিক একটি বিষয় নয়, ভূগোল জ্ঞানের রাজ্যে অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয় ।

কেন ক্যাম্পাসের ভূগোল ?

বিজ্ঞানের দুটো দিক আছে। একটা ছোট জিনিসকে বড় করে দেখার দিক, আর একটা বড় জিনিসকে ছোট করে দেখার দিক । প্রথমটা যেন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে জীবাণুকে দেখা আর দ্বিতীয়টা যেন অনেকটা টেলিস্কোপ দিয়ে মস্ত বড় গ্রহ-নক্ষত্রকে কাছে টেনে নিয়ে এসে দেখা । যখন আমরা পৃথিবী বা মহাদেশের ভূগোল পড়ি তখন প্রধান কতগুলি বিষয় মোটা দাগে দেখে নিই । ইংল্যাণ্ডের ভূগোল পড়তে গিয়ে আমরা ইংল্যান্ডের কোন একটি গ্রামের বা ছোট অঞ্চলের খুঁটিনাটি বিবরণ সম্পর্কে জানার চেষ্টাই করি না । এই ভূগোলটা টেলিস্কোপিক । অন্যদিকে যখন আমরা মেদিনীপুর শহরের ভূগোল সম্বন্ধে জানি তখন আমাদের শহরের বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি জানতে হয়। সেই ভূগোলে শহরের একটা মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডকেও খুঁটিয়ে বর্ণনা করার দায়িত্ব কোন ভূগোলবিদ এড়িয়ে যেতে পারেন না । এটাকে অনুবীক্ষণিক ভূগোল বলা যেতে পারে । আমি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের একটা অনুবীক্ষণিক ভূগোল তৈরির কথা বলতে চাইছি । এর প্রয়োজন শুধু ভূগোল চর্চার স্বার্থে নয়, আমাদের সকলের উপকার এতে জড়িয়ে আছে।

ক্যাম্পাসের অনুবীক্ষণিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা

যদি বেশ কয়েকজন ভূগোলের ছাত্রছাত্রী আমাদের এই ক্যাম্পাসের এক একটা অংশকে

বেছে নিয়ে তার একটা ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্র (topographical map) বানাতে শুরু করে তাহলে কেমন হয়? তারপর বিভিন্ন ঋতুতে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গার জলধারণ ক্ষমতা কিরকম হয় সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এরপর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ধরনের মাটি ও পাথরের বৈচিত্র্য সম্পর্কে খুঁটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে । আর একটা জিনিসও করা যায় । ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া যায়। এটা সহজেই বোঝা যায় যে এইসব বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্যাবলী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগতে পারে। ক্যাম্পাসের কোন জায়গায় কুয়ো খোঁড়া যায় বা পুকুর খনন করে মাছ চাষ করা যায়, কোন ধরনের জমিতে কি ধরনের গাছপালা লাগানো উচিত , কোন জায়গায় বিল্ডিংয়ের গঠনবৈচিত্র্য কিরকম হলে ভাল হয় সেসব সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে ভূগোল বিভাগ। সঙ্গে অবশ্যই উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগকে দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উন্নয়ণ পরিকল্পনা রচনার জন্য ক্যাম্পাসের ভূগোল সম্বন্ধে জানা দরকার । কিন্তু এখনও সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাবছেন না । এটা তাঁদের দোষ নয় । আমরা প্রকৃত অনুসন্ধান চালিয়ে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করে কর্তৃপক্ষকে তার গুরুত্ব বোঝাতে পারছি না । এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন সচেতন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা । একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক ।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জলের উৎস ও সমস্যা

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্তরকম জলের জোগান দেয় দুটি ভূগর্ভস্থ পাম্প । মাটির নিচের জল কি অফুরন্ত ? গত কয়েকবছর ধরে ভূগর্ভস্থ জলতল কি হারে নেমে যাচ্ছে ? আমাদের জলের চাহিদা কতটা বেড়েছে ? আগামী দশ কিংবা পনের বছরে এই জলের অবস্থা কি দাঁড়াবে ? কি কি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি ? আমরা তো সব বিভাগেই আজকাল স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন (Sustainable development) নিয়ে পড়াশুনো ও সেমিনার করছি । আমাদের নিজেদের জলের ব্যবহার ও ভবিষ্যতের জলের যোগান কি Sustainable ? ভূগর্ভস্থ জলের যোগানকে বাড়াবার কোন চিন্তা কি আমরা করেছি ? আমার নিজের অন্তত এটা ভাবতে লজ্জা হয় যে এইসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না । কিভাবে এসব তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তাও সবটা জানি না অথচ পরিবেশবিদ্যা নিয়ে পড়াই, প্রবন্ধ লিখি, কত কি করি। বলি জলই জীবন । ক্যাম্পাসের ভূগোল এইসব প্রশ্নের বেশ খানিকটা উত্তর দিতে পারে । আসুন আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী প্রজন্মের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্যাম্পাসের ভূগোল রচনা করি ।

মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙন ও পরিবেশ বিপর্যয়

সমীর মাইতি, সুশান্ত কুমার আশ ও শুভ্রা জানা (২য় বর্ষ)

ভূমিকা : নদীর স্বভাব অনুযায়ী চিরকালই তার এক পাড় ভাঙে এবং চর গড়ে উঠে অপর তীরে। বন্ধনহীন, মুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন বিশেষ দিকে নদীর এই খাত পরিবর্তন একটি স্থানে পৌঁছে থেমে যায়। তখন থেকে নদী আবার বিপরীত দিকে তার অতীতের খাতে ফিরতে চেষ্টা করে । এইভাবেই নদী নিয়মিত পেন্ডুলামের মত সক্রিয় থাকে । মালদহের গঙ্গানদীর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা তার বিপরীত চিত্র দেখা যায়। ফারাক্কা বাঁধ গঙ্গার গতিপথ রুদ্ধ করেছে । ফলে মালদহে গঙ্গার ভাঙন সমগ্র মালদহজেলা কেন মুর্শিদাবাদজেলাসহ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে ।

গঙ্গার ভাঙন সমীক্ষা :

গ্রামের নাম পঞ্চানন্দপুর। মালদহ শহর থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. দূরে গঙ্গার তীরে এই গ্রামের ভাঙ্গনের চিত্র অতি ভয়াবহ। পঞ্চানন্দপুরের এই ভাঙনের প্রধান কারণ হল গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন ; আর গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের প্রধান কারণ হল ফারাক্কা বাঁধ । গঙ্গার এই পূর্বমুখী গতি পরিবর্তন বহুদিন আগেই শুরু হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে ভূ-তাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থার (GSI) দুই বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র থেকে দেখিয়েছিলেন যে পঞ্চানন্দপুরের কাছে ভাঙ্গনের ফলে গঙ্গা ও তার শাখানদী পাগলার মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ কমছে । ১৯২৩ সালে এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের ব্যপ্তি ছিল ৮.৫৩ কিলোমিটার । ১৯৬৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২.০৪ কিলোমিটার ; ১৯৭৫ সালে আরো কমে হয় ০.৯৫ কিলোমিটার এবং ১৯৯৯ সালে দুটি নদীর মধ্যে দূরত্ব ছিল মাত্র ৩০০ মিটার। অতিসম্প্রতি দেখা যাচ্ছে গঙ্গা থেকে পঞ্চানন্দপুর এখন আর খুব দূরে নেই মাত্র ২৫০ মিটারের মধ্যে।

উন্নয়ণের নামে এদেশের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনেক নমুনা আমরা দেখেছি । ইংরেজ রাজত্বকালে কেবল তাদের আত্মস্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্প রচিত হয়েছিল । মানুষ ভেবেছিল স্বাধীনতার পর তার অবসান হবে, পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের শুভ-অশুভের কথা প্রাধান্য পাবে, গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা হবে । কিন্তু চুয়ান্ন বছরেও ইতিহাসে এই আশা বাস্তবায়িত হয়নি। ফারাক্কা পরিকল্পনা এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

ফারাক্কা বাঁধ তৈরির পর গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনে গত তিন দশকে প্রায় ১৮৫৬ কোটি টন পলি গঙ্গা গর্ভে সঞ্চিত হয়েছে । তাই গঙ্গা দ্রুত খাত বদলের চেষ্টায় পাড় ভেঙে চলেছে। সাথে সাথে গ্রামকে গ্রাম জলের তলায় যাচ্ছে । এর প্রতিরোধে পঞ্চানন্দপুর গ্রামে এক 'গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রক্রিয়া নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়েছে । গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রক্রিয়া নাগরিক কমিটির এক

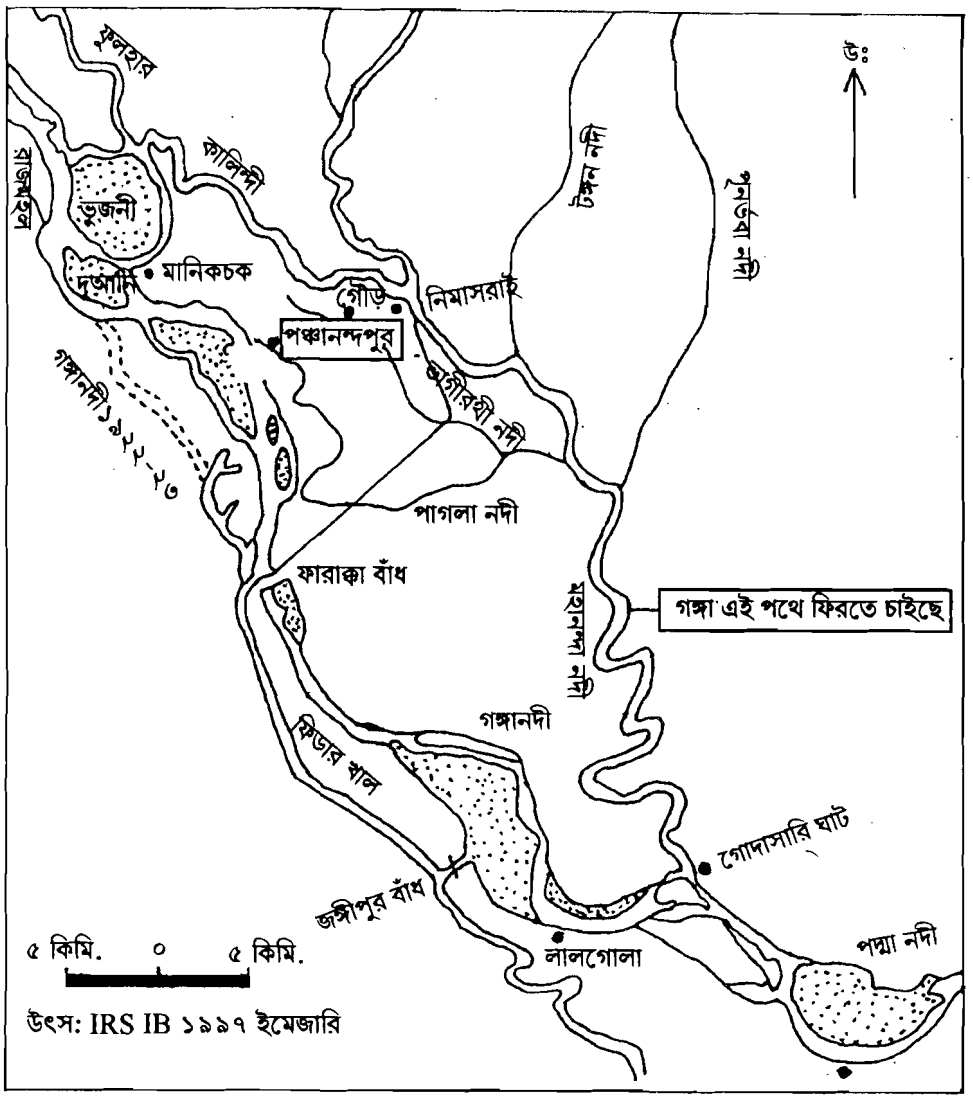

মালদহ জেলার পশ্চিম সীমায় গঙ্গানদীর গতি পরিবর্তন

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে শুখা মরসুমে মালদহের পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গার গভীরতা থাকে সর্বোচ্চ ১০.৬১ মিটার থেকে সর্বনিম্ন ১.৫২ মিটার। কিন্তু এখনকার বৃদ্ধ মাঝিদের মতে ৩০ বছর আগে ওখানে গঙ্গার গভীরতা ছিল ২৫ মিটারের বেশী, অর্থাৎ গত তিন দশকে পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গায় পলি জমেছে অন্তত ১৫মিটার। নদীখাত যত অগভীর হচ্ছে পাড় ভাঙার প্রবণতা ততই বাড়ছে।

'গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রক্রিয়া কমিটি'র সভাপতি হলেন পঞ্চানন্দপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রী কেদারনাথ মন্ডল। শ্রী মন্ডল গঙ্গাকে চেনেন তার হাতের রেখার মতো। এখন ভাঙ্গন রোধে আঁশে দালন গড়ার কাজে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। কেদারবাবু, তরীকুলবাবু প্রভৃতি গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা গেল গঙ্গা কিভাবে একের পর এক গ্রাম গ্রাস করছে। কেদারবাবু বলেন, 'আমার বয়স যখন ১২ বছর তখন গঙ্গা ছিল ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে। তখনও ফারাক্কা বাঁধ হয়নি। তাই গঙ্গাকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তার খেয়াল খুশিমতো ভাঙত। তবে প্রতিবৎসর বন্যা হত না। আর বন্যা হলেও তার ধ্বংসের তান্ডব কম ছিল। বন্যার পর বন্যার জলের পলি থিতিয়ে গেলে বা জল সরে গেলে প্রচুর বিরিকলাই ও অন্যান্য ফসলের চাষ হত। অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতির সাথে সাথে অর্থ উপার্জনের পথ তৈরি হত। কিন্তু ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরির পর এখন আলাদা চিত্র দেখা যায়। এই ফারাক্কা বাঁধের জল যাওয়ারজন্য যেমন ফিডার ক্যানেল করা হয়েছে তেমন জমা পলি অপসারণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। গঙ্গা আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং পঞ্চানন্দপুরকে গ্রাস করছে। কালিয়াচক থানার ১৮টি মৌজা ভেঙে গেছে। এখন ঘাস, খোল প্রভৃতি গ্রামকেও গ্রাস করছে। এ পর্যন্ত মোট ২৯টি মৌজা জলের তলায় চলে গেছে। কালিয়াচক থানার জলের তলায় যাওয়া উল্লেখযোগ্য মৌজা হল কাকড়ী, ঝাউনা, কাঁকড়ীবটা, ঝাউবনা ইত্যাদি। এই বন্যার করাল গ্রাসে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার চর্চা হারিয়েছে। পঞ্চানন্দপুরের এক বিধবা মহিলা সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দান করেন সুখী হাইস্কুলকে। সুখীময় দেবীর নামানুসারে সেই স্কুলের হয়। কিন্তু সেই স্কুলকে পাঁচবার ভেঙে আবার ভাঙ্গন অঞ্চল থেকে দূরে তৈরি করা হয়েছে। এইরকম বহু হাইমাদ্রাসা জলের তলায় চলে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে এই অঞ্চলের মানুষ গঙ্গার ভাঙ্গনে সব হারিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য পূর্ণিয়া সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে যাচ্ছে।

তরীকুলবাবুর বক্তব্য অনুসারে তিনি নিজে একসময় ৩০০ বিঘা জমির মালিক থাকলেও গঙ্গা তাকে আজ নিঃস্ব করেছে। গঙ্গার ভাঙনে জমি শিকার হওয়ার পর নিঃস্ব হয়ে অর্থ রোজগারের জন্য এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে পরে দিল্লীতে কাজের সন্ধান পেলেন। সেখানে কাজ করতে করতে গঙ্গার ভাঙনের কথা তাকে ভাবিয়ে তুলতে থাকে। পরে তিনি এসে এই গঙ্গা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দেন। তিনি নাগরিক কমিটির সচিব খিদির বক্সের সঙ্গে কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন। খিদির বক্স বলেন "সাপের মাথাটা চেপে ধরলে শরীরটা যেমন নড়াচড়া করে, ফারাক্কা বাঁধ তৈরির পর গঙ্গার তেমনই অবস্থা।" গঙ্গার এই ভাঙন প্রতিরোধে প্রতিবছর যে স্পার তৈরি হয় তা ভেঙে যায়। এই ভাঙনের শিকার হয়ে মানুষ এখন পঞ্চানন্দপুরে এসে ভীড় করছে। গত কয়েকদশকে

ভাঙনে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রায় ৪.৫ লক্ষ মানুষ। ভূতনী মৌজা ভেঙে যে চর সৃষ্টি হয়েছে সেখানে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ বাস করেন। এই হতভাগ্য মানুষেরা কার্যত পশ্চিমবাংলার নাগরিকত্ব হারিয়েছেন। এই বিস্তীর্ণ চরে বর্তমানে বিহারের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত অথচ এ পর্যন্ত মালদহ জেলার সর্বশেষ সেনসাস হ্যান্ডবুক (১৯৯১)-এ দেখানো হয়েছে এই এলাকাটি মালদহের অধীন।

পঞ্চানন্দপুরের লোকজন বলছে গঙ্গায় ভাঙনের ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ হচ্ছে কিন্তু কয়েকজনের হচ্ছে পৌষমাস। তাদের কাছে স্পার তৈরি একটি লাভজনক ব্যবসা, ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো। ভাঙনরোধের নামে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং তা পকেটস্থ হয় গুটিকয়েক নেতা, আমলা, মাফিয়া কন্ট্রাক্টারের। কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেই; মাটি পরীক্ষার বালাই নেই — শুধু ভরা বর্ষায় কিছু বোল্ডার ফেলাও, বিল বানাও; এই হল ভাঙন রোধের সরকারি ব্যবস্থা।

প্রতিবছর নতুন নতুন স্পার তৈরি হচ্ছে, এই স্পার তৈরি হয় কমপক্ষে ৪০ কিলোগ্রাম করে এক একটি বোল্ডার দিয়ে। স্বাভাবিকভাবে তা এই নরম পলিমাটিতে চাপ দিলে মাটি সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে সহজেই ভেঙে যায়। এছাড়া ভরা বর্ষায় গঙ্গা দিয়ে যে ১৮ থেকে ১৭ লক্ষ কিউসেকের প্রবল স্রোত বয়ে যায় সেই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে বাঁধ দিয়ে প্রতিহত করার চিন্তা অবাস্তব। অথচ এই প্রক্রিয়াই চলছে বছরের পর বছর। এর আগে ৯টি রিটায়ার্ড বাঁধ তৈরি হয়েছে। সাতটি জলের তলায় গেছে, অষ্টম বাঁধটি নির্মাণ হয়েছে পাগলা ও ছোট ভাগীরথী নামে দুটি শাখানদীর গতিরুদ্ধ করে। দেখে মনে হচ্ছে এই বাঁধটিরও একই দশা হবে। বাঁধ যাবে জলে, টাকা যাবে কিছু সুবিধাভোগী লোকদের পকেটে।

নদীবিজ্ঞানীরা বলেন যে এই যদি গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধের মূল পন্থা হয়, তাহলে পঞ্চানন্দপুরের যত এলাকা সব জলের তলায় তলিয়ে যাবে। ভবিষ্যতে কোন এক ভয়াবহ বন্যার সময় গঙ্গা হয়তো গতিপথ পরিবর্তন করে কালিন্দী নদীর পথ ধরে মহানন্দার সাথে মিশে যাবে। সেই সম্মিলিত ধারা ফারাক্কা বাঁধকে এড়িয়ে চলে যাবে। কলকাতা বন্দরও যাবে শুকিয়ে।

তাই বলা যায়, কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠনের আগে সেখানকার মানুষের অর্থাৎ যাদের জন্য এই পরিকল্পনা তাদের কথা মাথায় রাখতে হবে এবং এখনই সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত ড্রেজিং করে গঙ্গার খাত পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। পাশাপাশি গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করে গঙ্গা তীরের গ্রামগুলিকে যাতে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা না নেওয়া হলে শুধু পঞ্চানন্দপুরের বাসিন্দারা নয়, অদূরভবিষ্যতে ভয়াবহতম নদী বিপর্যয় মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু মানুষকেই প্রত্যক্ষ করতে হবে।

[এই রচনাটি বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের সাম্প্রতিক (ফেব্রুয়ারী ২০০২) মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙ্গন ও জনজীবন বিপর্যয়ের সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীর জন্য, বিশেষত মালদহ জেলায় সমীক্ষার কাজে যথাযথ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য লেখকদ্বয় অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র ও অধ্যাপিকা সুমনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ]

জলাভূমি সংরক্ষণ

পারিজাত সরকার (২য় বর্ষ)

জলাভূমি বা Wetland শব্দটি সাম্প্রতিক কালে একটি বহুল পরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জলাভূমিকে কেন্দ্র করেই এর দু'পাশে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই এর সংগে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে অনেক দেশেই এই জলাভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে চলেছে।

জলাভূমিঃ সমতল নিচু এলাকাতে জল জমে বা হ্রদ ছাপিয়ে জল জমে যে বিস্তীর্ণ জলাশয়ের সৃষ্টি হয় তাকেই জলাভূমি বলে। Swamp, marshes, derelict প্রভৃতি জলাভূমির ইংরাজী প্রতিশব্দ।

জলাভূমির গুরুত্ব ঃ জলাভূমির গুরুত্ব আমরা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই —

১) জলাভূমিতে সঞ্চিত নোংরা জলকে পরিষ্কার করা, শহরের বর্জিত জলে যে ভারী ধাতব পদার্থ থাকে তা জলাভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ, শৈবাল প্রভৃতি প্রাণী শোষণ করে নেয় এবং নোংরা জলকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করে।

২) বন্যার সময় অতিরিক্ত জল ধরে রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

৩) ভূ-গর্ভস্থ জলের সরবরাহে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

৪) জলাভূমিতে বিভিন্ন ধরনের শৈবালের উপস্থিতি বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলকে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়া অনেক লুপ্তপ্রায় প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাণ রক্ষা করে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় জীববৈচিত্র্য বা Bio-diversity রক্ষার্থে জলাভূমির যে বিশেষ ভূমিকা আছে সেকথা সম্যক উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের মৎস্য দপ্তর গত ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর ১লা আষাঢ় দিনটিকে 'জলাভূমি দিবস' হিসাবে চিহ্নিত করে আসছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর পুকুর, ১ লক্ষ ৭২ হাজার হেক্টর নদী, ৮০ হাজার হেক্টর খাল, ৪২ হাজার হেক্টর বিল-বাওড় এবং ১৭ হাজার হেক্টর জলাধার এলাকার জলাভূমি আছে। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে নগরবিস্তার; মজে যাওয়া খাল-বিল-নদী প্রভৃতিকে কৃষির জন্য পাট্টা দেওয়া এবং বিত্তশালীদের আগ্রাসী প্রচেষ্টা এই জলাভূমিকে সঙ্কুচিত এবং তার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। ফলে পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে চলেছে।

পরিবেশকে নির্মল ও দূষণমুক্ত করে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাই জলাভূমি ও জলাশয়কে ধ্বংস করার যে প্রয়াস বা চক্রান্ত ক্রমশ দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে পরিবেশ সচেতন মানুষমাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

গঙ্গোত্রী নেই গঙ্গোত্রীতে

রুমা দাঁ (প্রথম বর্ষ)

পিছু হটছে সব হিমবাহ। তাদের চেহারাও হয়ে যাচ্ছে শীর্ণকায়। সারা পৃথিবীতেই হিমবাহের এই করুন অবস্থা। পুণ্যসলিলা গঙ্গার প্রকৃত উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ মাত্র ৪০ বছরের মধ্যে পেছনে সরে গেছে প্রায় ৬০০মিটার। হিমালয়ের যে পর্যটন কেন্দ্রটি গঙ্গোত্রী নামে পরিচিত, সেখানে একসময় ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তদেশ। এখন তা সরে এসেছে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে গোমুখ নামক জায়গায়। এই স্থানচ্যুতি ঘটেছে মাত্র বিগত হাজার পাঁচেক বছরের মধ্যেই।

কিন্তু কেন এই সঙ্কোচন ? অনেক কারণই আছে, তবে মূলত আবহমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিকেই এরজন্য দায়ী করা হচ্ছে। এখন আমরা একটা উষ্ণযুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। সর্বশেষ যে তুষারযুগটি পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার দাপট শেষ হয়েছে মাত্র ১০ হাজার বছর আগে। ৩০ থেকে ৪০ হাজার বছর আগে প্লিস্টোসিন যুগের শেষভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ ডুবে ছিল বরফের নীচে। যদিও এখন অনেক ভূমিখন্ডই তার থেকে অব্যহতি পেয়েছে। তাহলে কি যতদিন যাবে তত তুষারবৃত অঞ্চল কমতে কমতে পৃথিবী একদিন একেবারে তুষারহীন অবস্থায় পৌঁছে যাবে ? চট্ করে 'হ্যাঁ' বলা অসম্ভব। কারণ কোটি বছরের নিরিখে মহাদেশগুলির নড়াচড়া এতই উল্লেখযোগ্য যে, হিমবাহ কখন কোথায় সৃষ্টি হবে তা একেবারেই বলা যায় না। মনে করা হয় প্রায় ২০ কোটি বছর আগে পর্যন্ত সব মহাদেশ একসঙ্গে যুক্ত ছিল। অ্যান্টার্কটিকা আর ভারতবর্ষ ছিল একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো। বিষুবরেখার কাছে এই মিলিত ভূখণ্ডে তখন নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, অসংখ্য আদিম বনানীর সমাহার, অর্থাৎ পরে অ্যান্টার্কটিকা সরে এসেছে দক্ষিণমেরুর কাছে আর ভারতবর্ষ তার সঙ্গ ত্যাগ করে জুড়ে গেছে এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, পৃথিবীর বয়স তো ৪০০ কোটি বছরের ওপর, সুতরাং এই সময়ের ব্যবধানে মহাদেশগুলি যে একাধিকবার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়নি তার নিশ্চয়তা কি ? এরফলে তুষার আর হিমবাহের ঠিকানা বদল হয়ে থাকতে পারে কয়েকবারই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হিমবাহের সম্মুখভাগ একটা বিশেষ উষ্ণতার অঞ্চলে গিয়ে আর যেন এগোতেই চায় না। এইসময় উষ্ণতা আরও বেড়ে গেলে সম্মুখভাগ গলতে গলতে ছোট হতে থাকে। ফলে মনে হয়, হিমবাহ যতদূর এসেছিল তার থেকে যেন পিছু হটছে।

পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী জমাট বাঁধা গঙ্গোত্রী হিমবাহ যেন মহাদেবের জটা, তাই এখানেই যেন আবদ্ধ হয়েছিল তুষারিত গঙ্গা। এখন সেই হিমবাহের গলনে সৃষ্টি হয়েছে ভাগীরথী, যা নদীমাতৃক ভারতভূমিকে উর্বর করে। পৌরাণিক মানুষরা 'গঙ্গোত্রী' হিমবাহকে যেখানে যে রূপেই দেখে থাকুন, এখন তা আর গঙ্গোত্রীতে নেই। তাই গঙ্গোত্রী নামে তীর্থক্ষেত্রের যে গঙ্গামন্দিরে

প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক ভিড় করেন, সেখানে আজ আর গঙ্গোত্রী হিমবাহকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তুষারযুগে এই হিমবাহ এগোতে এগোতে যে স্থানে পৌঁছেছিল সমুদ্রসমতল থেকে তার উচ্চতা মাত্র ১০হাজার ফুটের কাছাকাছি। এই স্থান এখনকার গঙ্গোত্রীর অনেক নীচে। হিমবাহ এগিয়ে চললে তার তলদেশের ভূমি যেরকম বাটির মত অবতল রূপ ধারণ করে, পার্শ্বস্থ প্রস্তরখণ্ড ক্ষয় হতে হতে যে রকম মসৃণ হয়ে যায়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে গঙ্গোত্রী হিমবাহ কতদূর নেমে এসেছিল। তাই অনুমান করা যেতে পারে এখনকার গঙ্গোত্রী হিমবাহ যা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৬ কিমি., তা অন্তত দ্বিগুন বেড়ে গিয়েছিল গত তুষারযুগের কোনো এক সময়ে। এখন গঙ্গোত্রী হিমবাহের সম্মুখভাগ যত পুরু তার চেয়ে প্রায় ২০০ ফুট বেশী পুরু ছিল তুষার যুগে। হিমবাহবিদ্‌দের মতে বর্তমানে গঙ্গোত্রী হিমবাহের পিছু টানের হার বছরে ১৪.৬মিটার।

হিমবাহের এগিয়ে আসা বা পিছু হটা তার আকৃতির উপর নির্ভর করে না। তবে পিছু হটে বলেই আমরা ভূমিক্ষয় সম্পর্কে জানতে পারি। কিভাবে পাহাড়-পর্বত চূর্ণ করে, উপত্যকায় ঘর্ষণ করে হিমবাহ এগিয়ে যায়, তা জানার সবচেয়ে ভাল উপায় পিছিয়ে আসা পথটুকু নিয়ে গবেষণা। শুধু তাই নয়, ফিরে যাওয়ার সময় যেসব স্মৃতিচিহ্ন রেখে যায়, তা বিশ্লেষণ করে হিমবাহের বয়স এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

কিন্তু এই সৌভাগ্য বেশিদিন সইলে হয়। কারণ অনেক আবহবিদদের অভিমত, প্রকৃত উষ্ণযুগ শুরু হতে নাকি অনেক দেরী। যে কোনও তুষার যুগের অন্তর্বর্তী সময়ে কয়েক হাজার বছরের জন্য উষ্ণতা একটু বাড়ে। এখন নাকি সেই অন্তর্বর্তী সময়ই চলছে। তাই আবার যেকোন দিন পৃথিবীর সামগ্রিক উষ্ণতা কমতে কমতে অবশিষ্ট তুষারযুগের ফলভোগ করা শুরু হয়ে যাবে। তখন হয়তো আবার হিমবাহগুলি পিছু হটার পথ ধরে প্রবল প্রতাপে এগিয়ে আসবে।

কোলাঘাটে রূপনারায়ণে ভাঙ্গন— পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি মাত্রা

মৌমিতা মেটলা (২য় বর্ষ)

জল মানুষকে জীবন দান করে, কিন্তু জল কি মানুষের জীবন ছিনিয়েও নেয় ? রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিম তীরবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোলাঘাটের পীরতলা নিবাসীদের কাছে প্রশ্নটা অস্বাভাবিক নয়। ১৯৯২ সালে ঐ স্থানটিতে নদীর পাড় বরাবর একটি ফাটল সৃষ্টি হয়। অতি ধীরগতিতে ফাটল বরাবর স্থানটি বসে যেতে থাকে। এর গতি এতই ধীর ছিল যে ঘটনাটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এরপর ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে আরও একটি ফাটল দেখা যায়; এবং রাতারাতি মুখ্য ফাটল ধরে বেশ কিছুটা অংশ দোকানপাট সহ বসে গেলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে নদীপাড়ের এই অংশটি ঘিরে এর ওপর দিয়ে মানুষ, যানবাহন ইত্যাদির চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং স্থানটিতে আবার মাটি দিয়ে ভরাট করে ব্যবহারযোগ্য করে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর আবার অঞ্চলটি বসে যায়। অবশেষে লোহার খাঁচা করে ঝামা ফেলে পাড়টি বাঁধানো হয়। এতে অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। বরং কয়েকমাসের মধ্যে অঞ্চলটিতে লোহার খাঁচা ভেঙ্গে ঝামাগুলি ভারি ভূগর্ভে প্রবেশ করে। এরপর ভূ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্থানটি পরীক্ষা করানো হয়। সম্প্রতি তারা মৃত্তিকা পরীক্ষা করে এবং সংগে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের মতামত জানান।

রূপনারায়ণ নদী পীরতলার কাছে বাঁক নিয়ে পূর্বে বেঁকে গেছে। এই নদীর বুকে তিনটি সেতু আছে বাস ও ট্রেন চলাচলের জন্যে। পাশাপাশি তিনটি ব্রীজের মধ্যে মাঝে নদীর জলস্রোতে ব্যাঘাত ঘটে এবং এই বিশাল জলরাশি পীরতলার কাছে বাঁকের মুখে এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে। আবার পীরতলার বাঁধের গায়ে একটি বিরাট পুকুর আছে; মনে করা হয় সমস্যা সেখানেই। নদীর জলরাশির সঙ্গে বাঁধের তলা দিয়ে পুকুরের জলরাশির মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছে। ফলে ওপারের বাঁধটি দুধের সরের মতো ভাসছে। তাই মাঝে মাঝে বাঁধের তলদেশের ঐ জলরাশির মধ্যে অতিরিক্ত স্রোত সৃষ্টি হলে বা বায়ুর সম্প্রসারণ-সংকোচন ঘটলে ওপর থেকে সবকিছু নিচে ধ্বসে পড়ছে। বর্তমানে ভূ-বিজ্ঞানীর ওখানকার কয়েক'শ মানুষের নিত্যব্যবহারযোগ্য ঐ পুকুরটিকে ভরিয়ে দিয়ে বাঁধটি কিছুটা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এইস্থানে নদীর জলরাশি এতই ধাক্কা মারে যে বাঁধটি কতটা ও কতদিন রক্ষা করা যাবে তা এখন বলা যাচ্ছে না। বর্তমানে আরও একটি সড়কসেতু তৈরি শুরু হয়েছে রূপনারায়ণের বুকে। এরফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ আরও ব্যহত হবে এবং কোলাঘাটের দিকে নদীর তীর বরাবর ভাঙন সমস্যাও আরও প্রকট হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মানুষের এত প্রযুক্তিবিদ্যার আস্ফালন সত্ত্বেও প্রকৃতির কাছে মানুষ যে কতটা অসহায় এ ঘটনায় স্পষ্ট প্রমাণিত। এ বিষয় নিয়ে বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্ ও পরিবেশবিদ্দের বিশেষ করে ভাববার সময় এসেছে।

বাতাস যদি বদলে যায়

অমলেশ রাউৎ (দ্বিতীয় বর্ষ)

একটা অতিকায় টাইম মেশিন মারফত পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যদি নামিয়ে দেওয়া হয় আজ থেকে দুশো কোটি বছর আগের পৃথিবীতে, তাহলে তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। শুধু খাবার-দাবারের অভাবেই তারা মারা যাবে এমন নয়, তাদের মৃত্যুর কারণ হবে ওই পৃথিবীর বাতাস। শ্বাস নেওয়ার জন্য যে অক্সিজেন ছাড়া আমাদের চলে না, তা তখনও বাতাসে জমে ওঠেনি যথেষ্ট পরিমাণে।

এটা আমরা জানি যে পৃথিবী একদিনে আজকের অবস্থায় আসেনি। প্রাণীজগতের জন্য আজকের পৃথিবীতে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন নিতান্তই প্রয়োজন। কারণ এটা ছাড়া আমাদের জীবন অচল। কিন্তু সেই দুশো কোটি বছর আগের পৃথিবীতে এমন অজস্র এককোষী প্রাণী ছিল যাদের কাছে অক্সিজেন ছিল মারাত্মক বিষ। তাই তারা বাতাসে অক্সিজেন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করল। পৃথিবীর খাতায় নাম ছিল একদল জীবের, বাতাস বদলে এনে বসাল আর একদলকে।

এইরকম ঘটনা যদি এখনও ঘটে ? না ঘটার কিছু নেই। আমরা সব সময় প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন টেনে নেওয়া সত্ত্বেও তা কমছে না কারণ প্রতিমুহূর্তে সবুজ উদ্ভিদ তাকে আবার বাতাসে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই যোগ আর বিয়োগের দুটি দিক সমান না হলেই বাতাসটা পাল্টে যাবে। তখন তার টাইম মেশিন লাগবে না।

কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বাড়ানো খুব সোজা। হয় যোগ বাড়িয়ে দাও —বেশি বেশি কাঠ, কয়লা, খনিজ তেল এইসব পোড়ালেই CO_2 বাড়বে ; অথবা বিয়োগ কমাও —গাছপালা কেটে ফেল, CO_2 শুষে নেওয়ার পরিমাণ নামতে বাধ্য। কিন্তু কি হয় CO_2 বেড়ে ? CO_2 বেড়ে গেলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বাড়লে বরফ গলে যাবে, মরুভূমির আয়তন বাড়বে, গিলে ফেলবে সুফলা জমিগুলোকে। উষ্ণতা বাড়লেই খ্যাপা দানবের মতো একএকটা ঘূর্ণিঝড় তাণ্ডব চালাবে পৃথিবীর এখানে ওখানে। তার লক্ষণ যেন দেখা যাচ্ছে এখনই প্রতিবছর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে, বরফ গলা জলে সমুদ্র তার আয়তন বাড়িয়ে নেবে। আজকের সুন্দরবনকে তখন খুঁজতে হবে জলের নীচে, কলকাতা শহরের কোল ঘেঁষে ঠেউ ভাঙবে সমুদ্র। লোনা জল ঢুকে পানীয় জলের অভাব জাগাবে। এর প্রভাব পড়বে চাষের ফসলে। পৃথিবীজোড়া এত মানুষ কী করবে তখন?

এখনই যদি ব্যবস্থা নিয়ে বাতাসে CO_2 এর 'যোগ' আর 'বিয়োগ' সমান করে দেওয়া যায় তাহলেও শতাব্দর পর শতাব্দ ধরে তাপমাত্রা বেড়ে চলতে পারে ; কারণ এরমধ্যেই অতিরিক্ত পরিমাণ CO_2 বাতাসে মিশে গেছে। তা বলে বসে থাকা চলে না, আরও গাছ লাগিয়ে জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে এই রাক্ষসকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে যেতেই হবে। অক্সিজেন বেড়ে যাওয়ায় একদল জীব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেজন্য তারা নিজেরা দায়ী ছিল না। আমাদের বেলায় মনে হয় সে সান্ত্বনাও থাকবে না। বাতাসটাকে বদলে দিয়েছি আমরাই।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিবেশ রক্ষার সমস্যা

কল্লোল সরকার (প্রথম বর্ষ)

পরিবেশ বিপন্ন হলে, বিপন্ন হয় মানুষও । তাই পরিবেশকে মানুষ তার নিজের স্বার্থেই রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়েছে । অথচ প্রচলিত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এই পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যবস্থার মোদ্দা কথা আশু মুনাফা এবং অতিরিক্ত অর্থ অর্জন করে ভোগ এবং বিলাসিত বাড়ানো, তাই ভোগবাদই নিঃশেষে নষ্ট করছে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ । গান্ধীজী যথার্থই বলেছিলেন, 'বসুন্ধরা আমাদের সব চাহিদা মেটাতে পারে, যা পারে না তা হল আমাদের লোভ ও লালসা'।

পরিবেশ রক্ষা নিয়ে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হলেও প্রথম বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি এইসব সম্মেলনের যৌথ সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবায়িত করেনি। ১৯৯২ সালের 'রিও বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলনে' বলা হয় ২০০০ সালের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনবে ১৯৯০ সালের অবস্থায়। কিন্তু কাকস্য পরিদেবনা । ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে এক বিশ্ব সম্মেলন হয় । আলোচ্য বিষয় আবহাওয়ার পরিবর্তন । ১৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন আলোচনায় । তৈরি হয় কিয়োটো প্রোটোকল। স্থির হয় উন্নত দেশগুলিকে Co_2এর মাত্রা কমাতে হবে । ১৯৯০ সালে তাঁরা যে পরিমান এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দিত, ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তা নামিয়ে আনতে হবে অন্তত ৫.২ শতাংশে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭শতাংশ কমিয়ে আনার দায়িত্ব নেয় । কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখেনি এই দেশ ।

২০০১ সালের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কিয়োটো প্রোটোকল নিয়ে আবার সম্মেলন হল জার্মানীর বন শহরে; তাতে অংশগ্রহণ করে ১৮০টি দেশের সরকারী কর্তারা । মার্কিন রাষ্ট্রপতি কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি মানবেন না কিয়োটো প্রোটোকল । বস্তুত মার্কিন অর্থনীতি এখন গভীর সঙ্কটে । এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজছে আমেরিকা । পরিবেশ রক্ষার বাড়তি দায় নেবার মতো অবস্থায় নেই পুঁজিবাদের প্রতিভূ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । দুনিয়ার মোট CO_2নিঃসরণের ২৫ শতাংশ মার্কিনী অবদান । এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে কিয়োটো প্রোটোকলকে কেন্দ্র করে পরিবেশ সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ নিয়ে ।

মানবজাতির সামনে পরিবেশ সংরক্ষণ মস্তবড় চ্যালেঞ্জ । উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বব্যাপী করে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যাবে না । প্রধান বাধা উন্নত প্রযুক্তির মালিকদের কাছ থেকে; কারণ এরা চায় পুঁজির পাহাড়, অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেন উৎপাদন বাড়াতে হবে । পুঁজিবাদের মানবিক দিক নেই, তাই 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাতে' তারজন্য সুস্থ পরিবেশ রচনার দায় নেই পুঁজিবাদের । কারণ ভোগবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থিতিযোগ্য উন্নয়নের (Sustainable Development) পরিপন্থী । তাই সর্বপ্রথম চাই প্রচলিত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সমূল উৎপাটন । তাহলেই সূচিত হবে পরিবেশ সংরক্ষণের মূল সমাধান ।

কালের যাত্রার ধ্বনি

সুরঞ্জনা প্রধান (প্রথম বর্ষ)

প্রতিদিন সকাল-দুপুর-বিকাল গড়িয়ে চলে
এক একটা দিন-মাস-বছর পেরিয়ে
দশক-শতক বাঁধা, একাল-সেকাল,
আসে যায় নতুন শতাব্দী, নতুন মিলেনিয়াম।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নবীন জয়যাত্রায় মনে হয়
বিশালায়তন গোটা পৃথিবীটা এখন হাতের মুঠোয়,
দেশের সমৃদ্ধি, বিকাশ, উন্নয়ণের পালাবদল —
সভ্যতার অগ্রগতির নিদর্শন।
এরই মাঝে প্রশ্ন ওঠে — জীবন না মৃত্যু!
সংগঠিত হয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগ্রাম;
চেতনায় বিতর্ক চলে — ধ্বংস নাকি নির্মাণ ;
সারা দুনিয়া সোচ্চার হয় — 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'।
হিরোশিমা-নাগাসাকির পরমাণু বীভৎসতা
আমাদের আজও আতঙ্কিত করে।
নিউইয়র্কের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ভেসে ওঠে টিভির পর্দায়
ওসামা বিন লাদেন — আজ বিশ্ববাসীর মুখে মুখে।
এদিকে কাবুল-কান্দাহারের শীতল বাতাস ;
নাশকতায় আচ্ছন্ন, বারুদ-বাষ্পে তাই উত্তপ্ত।
অনিকেত অবগুন্ঠিতা নারী আর নিষ্পাপ শিশুর সারি
ভয়ার্ত নির্বোধ বোবা দৃষ্টির জিজ্ঞাসা —
কোন্ অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আগুয়ান আমরা!

বর্তমান কৃষি বনাম পরিবেশ সমস্যা

সংগ্রাম সিং মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

বর্তমানে কৃষিতে আমরা নিত্যনতুন উচ্চফলনশীল জাতের শস্য চাষ করে চলেছি । এর উদ্দেশ্য হল বিশাল ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানো । উচ্চফলনশীল যে কোন ফসল চাষ করতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় এবং ফসলও প্রচুর পাওয়া যায় । কিন্তু এই নতুন কৃষিপ্রযুক্তির ফলে যেভাবে পরিবেশের বিপর্যয় নেমে এসেছে তাতে এই বর্তমান কৃষির গৌরব আর কতকাল থাকবে তা নিয়ে সকলের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ।

আজকের কৃষিতে এদেশে আমরা যেসব কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে চলেছি তা কতটা নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য সেটাই এখন গোটা বিশ্বে চিন্তার বিষয়। কারণ অন্যান্য বহুদেশ যে সব কীটনাশক বহুকাল আগে থেকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল আমাদের কৃষক সম্প্রদায় তা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে চলেছে। যেমন — থাইমেট, থাইমেন এম.জি, ডেমিক্রন, অ্যাকসন-৫০ ইত্যাদি ; যার দাপটে মৃত্তিকার উর্বরতা তো নষ্ট হচ্ছেই এমন কি কৃষকের বন্ধু কেঁচোও বিদায় গ্রহণ করছে । ' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'(WHO) সারা বিশ্বের ৭৭শতাংশ কীটনাশককে এখন বিষ বলে ঘোষণা করেছেন । বর্তমানে আমরা যেসব ফসল খাদ্যরূপে গ্রহণ করছি, তাতে ৩০শতাংশ বিষ ফসলের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এরফলে বিভিন্ন জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে ; মানুষ ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছে ক্যান্সারে, হয়ে পড়েছে বিকলাঙ্গ এবং মানসিক জটিলতা দেখা যাচ্ছে অনেকের মধ্যে।

বাস্তুতন্ত্র সর্বনাশের ফলে কৃষিতে আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে; তা হল পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গদের অবিলুপ্তি । মৌমাছি, বোলতা, ভোমরা এরা আর নেই বললেই চলে ; সেখানেও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। বকেরা ল্যাটা পোকাকে মেরে ফেলতো কিন্তু কীটনাশক ঔষুধ খেয়ে তারাও প্রায় অবিলুপ্তির পথে চলে যেতে বসেছে । উপগ্রহ চিত্র (Remote Sensing) থেকে দেখা গেছে যে প্রতিবছর ১.১ মিলিয়ন হেক্টরে বনভূমি নষ্ট করা হচ্ছে । এর মূল কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি । কিন্তু এই বনভূমি ধ্বংসের পরিণাম কি ? এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তামিলনাড়ু । ১৯৮৩ তে তামিলনাড়ুতে যে খরা এসেছিল তার মূলে ছিল নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস। এই দিক থেকে কৃষিব্যবস্থার ভারসাম্য পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়তে চলেছে।

যে অর্থনৈতিক বিকাশের পথ আমরা বেছে নিয়েছি তাতে উন্নতির তুলনায় পরিবেশ বিপর্যয় আরো বেশী হচ্ছে । ভারসাম্য হারাচ্ছে বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্যের বিনাশ ঘটছে । তাই কৃষিপ্রযুক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে আধুনিক কীটনাশক ঔষধের প্রয়োগ ছাড়াই ফসল ফলানো যায় । এরজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সহনশীল উচ্চফলনশীল জাতের উৎপাদন করতে হবে এবং 'সুসংহত রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসলের কীটশত্রু দমন করতে হবে । যতশীঘ্র আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে প্রকৃতির আত্মশোধনের ক্ষমতা নিঃশেষিত ততই মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে ।

পরিবেশনির্ভর বাণিজ্য ও তার প্রতিক্রিয়া

সমীর মাইতি (দ্বিতীয় বর্ষ)

পরিবেশ নিয়ে ব্যবসা চলে না। যেমন ব্যবসা চলে না ক্ষুধার্ত মানুষের খাবার, মুমূর্ষু মানুষের ওষুধ, বস্ত্রহীন মানুষের বস্ত্র, বা গৃহহীন মানুষের গৃহ নিয়ে। পরিবেশ রক্ষা নিয়ে চিন্তা আগামী একশ-দুশ-হাজার-দুহাজার বছরের জন্য নয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান অনুযায়ী পৃথিবীর আয়ু এখনও প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর; কেননা, ঐ সময় পর্যন্ত বাঁচবে আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য। ফলে জীব বিবর্তনের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ যুক্তিবোধকে যদি প্রতিমুহূর্তে মানুষ কাজে লাগাতে পারে, তবে সভ্যতাও বেঁচে থাকবে সবুজগৃহ পৃথিবীর সঙ্গে। এ নিয়ে ব্যবসা করার অর্থ অনাগত ভবিষ্যতের মানবশিশুদের বাঁচা-না-বাঁচা, এই পৃথিবীর সৌন্দর্যে তাদের আসা-না-আসা নিয়ে খেলা করা। বর্তমান পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ এখন সেই খেলায় মেতেছে। ব্যবসা ছাড়া ওরা কিছু চায় না। সবুজ নিয়ে ব্যবসা করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ এখন হয়ে উঠছে 'সবুজ সাম্রাজ্যবাদ'।

এই সবুজ সাম্রাজ্যবাদের মূল অস্ত্র গ্যাট বা ডাঙ্কেলের প্রস্তাব। যা পরিবেশের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলি একে সমর্থন করেছে; কারণ কাজে আসবে বাজার দখলদারির ক্ষেত্রে। এ বাজার তৃতীয় বিশ্বের ভুখা মানুষের বাজার। তৃতীয় দুনিয়ার গরিব মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে ব্যবসায় তৈরি হওয়া এবং পুঁজিবাদের পণ্যসম্ভারের চটকে চমকিত নব্য উচ্চবিত্তদের বাজার। ধনবাদী দেশগুলির উদ্দেশ্য সারা বিশ্বকে বাজার দখলদারির লক্ষ্যে ছুটিয়ে দাও আর তার অলক্ষ্যে নিজের কাজ হাসিল কর। ক্ষুধাতুর মানুষ খাদ্যের জন্য হাহাকার করছে, ওদিকে কান দিও না, সভ্যতার অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলি পরিবেশ নিয়ে বাণিজ্যিকরণের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে বাঁচতে এখন জীবপ্রযুক্তি ও কৃষির উপর জোর দিচ্ছে।

উন্নতদেশগুলি তার ফেলে দেওয়া পুরানো পরিবেশের শত্রু প্রযুক্তি চালান করছে। তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলিতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পরিবেশের প্রযুক্তি গড়ে তোলার টাকা উঠে আসবে পুরানো প্রযুক্তি দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা করে। যেমনটা এখনও হচ্ছে। উন্নত দেশগুলির বাতিল হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ঔষধগুলির রমরমা বাজার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। কৃষিতে যে কীটনাশক আর উন্নত দেশে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে উন্নতদের ময়লা ফেলার জায়গা অনুন্নতদের দেশে। তাতে সেখানে পরিবেশের ক্ষতি হলে তা তাদের মেনে নিতে হবে।

এর ফল শুধু উন্নয়নশীল দেশেই পড়ছে না। উন্নতদেশেও তা পড়ছে। এরফলে পরিবেশ দুষণের শিকার ও ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। ওজনস্তরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের দাপটে গ্রীণ হাউস এফেক্ট সৃষ্টি হচ্ছে। এরফলে মেরু অঞ্চলের বরফগলে সমুদ্রের জলতল ক্রমশ উপর উঠছে।

পরিবেশ নিয়ে বাণিজ্যকরণের প্রতিরোধ না গড়ে তুলতে পারলে এই বিশ্বপ্রাকৃতিক পরিবেশ আগামীদিনে শিশুদের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অযোগ্য হয়ে উঠবে।

সভ্যতার বিকাশ ও পরিবেশ সমস্যা

ক্ষীরোদ ওরাং (প্রথম বর্ষ)

মানুষের বুদ্ধি যখন বনের আগুনকে ঘরে আনতে ও তার ব্যবহার করতে শেখাল তখন থেকেই চারপাশের পরিবেশকে তার কুক্ষিগত করার চেষ্টায় সে মেতে উঠলো । এই অবস্থা নতুন করে যুক্ত হল যখন যাযাবর প্রবৃত্তি ছেড়ে মানুষ চাষ করতে শিখল । খাওয়ার চিন্তা মেটার সাথে সাথে তার নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখহীন ও তার প্রতিকারের জন্য নতুন আবিষ্কার করতে করতে অবশেষে একদিন চাকা আবিষ্কার করে ফেললো। এরপরেই শুরু হল লাগামহীন মানব সভ্যতার জয়যাত্রা। চাকা ঘোরানোর জন্য ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য বিভিন্ন শক্তির খোঁজ । কয়লা, খনিজতেল বা বিদ্যুৎ যাইহোক না কেন বেশীরভাগই সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের (জল ও জীবসম্পদ ছাড়া) দহনের ফলে উৎপাদিত শক্তির ব্যবহার আজ অবধি প্রধান ব্যবহৃত শক্তির উৎস । এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় । মানুষের জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে আরও খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটানোর জন্য বার বার একই জমিতে খাদ্যশস্যের ফলনের জন্য ও উৎপাদন মাত্রার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সারের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, ডেকে আনছে আরও মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় । এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ সাধারণ মানুষ দৈবের উপর ছেড়ে দিলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে বিভিন্ন কলকারখানা নিঃসৃত দূষক পদার্থের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের স্বাভাবিক উপাদানের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটায় ।

আমাদের মধ্যে একটি ধারণা এমনভাবে অবেচেতন মনে গাঁথা হয়ে আছে যে পরিবেশ সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা দেখা দিলে সাধারণতঃ কোন জীববিজ্ঞানীর অথবা কোন রসায়নবিদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করি । এর কারণ হল আমরা ভ্রান্তভাবে অনেকটা পূর্বনির্ধারণ করে নিই যা হল মনুষ্য ধারণা । পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবক্ষয়ের মূল কারণ মানুষের অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ। 'শুধু মানুষের স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণের দরকার' এই কথাটির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন । শুধু মানুষের স্বার্থ কথাটির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য লুকিয়ে আছে । উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি যে প্রায় দুষণহীন গ্রাম্য পরিবেশের একটি বড় জলাশয় যার উপর গ্রামের অনেককিছু নির্ভর করে । গ্রামের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, মানুষের স্বাস্থ্য , পানীয়জলের সরবরাহ , বাজারে মাছের সরবরাহ, দৈনন্দিন গৃহস্থলীর কাজকর্ম, এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও সামগ্রিকভাবে এর ওপর নির্ভরশীল । এর সমস্তটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে জলাশয়টির প্রাকৃতিক ভাবে যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে ঐ জলাশয়ের দুষিত জল ব্যবহারে সৃষ্টি হবে নানাবিধ রোগের উপসর্গ, ঘটে স্বাস্থ্যহানি, আর্থসামাজিক অবনমন ইত্যাদি । সুতরাং এখন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সুরক্ষার সংগ্রামও জড়িত। তাই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার ভার এখন মানুষেরই হাতে এবং এর সঠিক সিদ্ধান্ত মানুষকেই নিতে হবে ।

মাউন্ট এট্না

ডালিয়া দত্তপাট (প্রথম বর্ষ)

দীর্ঘদিনের সুপ্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠে আবার আগুন ছুঁড়তে শুরু করেছে ইতালির আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এট্না । মাউন্ট ভিসুভিয়াসের পাশাপাশি মাউন্ট এট্নার সংহারমূর্তি দেখে মনে হবে আর এক ভিসুভিয়াস উপহার দিতে চলেছে এই পৃথিবী ।

প্রায় দেড়হাজার বছরের লম্বা ঘুম যে ভাঙতে চলেছে তার আগাম আভাস পাওয়া গিয়েছিল সিস্মোগ্রাফে হালকা অথচ একটানা কম্পন দেখে, প্রায় বছর দুয়েক আগে থেকেই । কম্পনের এপিসেন্টার ছিল এট্না । মাটির নিচে কয়েক হাজার ফুট গভীরে ছিল তার উৎস । এট্নার জ্বালামুখে প্রথম ধোঁয়া উঠতে দেখা যায় বছরখানেক আগে; প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে, পরে একটানা। গরম হতে শুরু-করে আকাশ বাতাস ও সেইসঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠ । ভূ-কম্পনের মাত্রা এতই কম ছিল যে সবাই ভেবেছিল এট্না এবার ও শুধু ধোঁয়া উড়িয়েই থেমে যাবে ।

কিন্তু প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই চলে । হঠাৎই ফেটে যায় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ । আকাশে ছিটকে ওঠে আগুন । কিছু বুঝে উঠবার সুযোগ না দিয়েই শুরু হয় একটানা উদ্গিরণ। জ্বালামুখ থেকে অন্তত ৩০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে ছিটকে পড়ছে ছাই আর পাথর, বাদামি-লাল ধোঁয়ায় ভরে আছে প্রায় ১৬ বর্গ কি.মি. জায়গা । বাতাসে পোড়া সালফারের তীব্র শ্বাসরোধী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ২৫ কি.মি. ব্যাসের জায়গা জুড়ে । ২০০১ সালের জুন মাস থেকে শুরু হয়েছে এট্নার উদ্গিরণ । কবে শেষ হবে তা একমাত্র বলতে পারে এট্নাই ।

ইতিমধ্যে এট্না পাহাড়ের ঢালে ও পাদদেশে কয়েক হাজার জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । দেশ ছেড়েছে পাখি, প্রজাপতি, হরিণ। বাতাসে সালফারের তীব্র গন্ধে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে শ্বাসরোধকারী সমস্যায়। দূষিত অ্যাসিডের বাষ্প নষ্ট করছে দূরবর্তী মার্বেল পাথরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। পাহাড়ের যে দুটি ঢাল বেয়ে এখনো লাভাস্রোত নামছে, সেই পথে কোনো শহর ও নগর নেই । কিন্তু যদি ভূমিকম্পের ফলে লাভাস্রোত দিক পরিবর্তন করে তবে সেই মারণ লাভা গ্রাস করে নিতে পারে মানুষের তৈরি কোন জনপদের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় প্রশাসন। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য হেলিকপ্টার থেকে জল ও অগ্নিনির্বাপক রাসায়নিক ছড়ানোর ব্যবস্থা করেছে ।

তবুও প্রকৃতির এই রুদ্ররোষের সামনে ২১ শতকের আধুনিক প্রযুক্তিও যে কত অসহায় তাই এখন ভাববার বিষয় । মানুষের এই নির্মম পরাজয় একটা কথাই প্রমাণ করে প্রকৃতির সামনে আমরা আজও শিশুর চেয়েও অসহায় । যে সৃষ্টি করে, সেই ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে, এবং যা সুন্দর তাই ভয়ঙ্কর ।

মধ্যপ্রাচ্যের পরিবেশ সমস্যা

বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় (২য় বর্ষ)

নীল আকাশ, নীল সমুদ্র ..... এ সমস্তই কুয়েতবাসী ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ভুলে গিয়েছিল। পারস্য উপসাগরের তীরের ছোট্ট এই দেশটির বাতাসে তখন আগুনের হল্কা, গরম হাওয়ায় উড়ে চলেছে কার্বনের কালচে গুঁড়ো।

১৯৯১ সালে 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম'-এ প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের ইরাকি বাহিনী বহুজাতিক বাহিনীর হাতে পরাস্ত হওয়ার পর ৪০০-এর বেশী তৈলকূপে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কুয়েত, বাহরিন, সৌদি আরব ও কাতারের তটরেখা বরাবর পারস্য উপসাগরের ৬০০ বর্গমাইল জুড়ে ৬০০,০০০ ব্যারেল খনিজ তেল ছড়িয়ে দেয়। তাই সমুদ্র এখানে হয়ে যায় কালো এবং ভারী অশোধিত তেলে পূর্ণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ২৫,০০০ ব্যারেল তেল প্রতিবছর সমুদ্রে মিশে পাইপলাইন চুঁইয়ে বা ট্যাঙ্কার থেকে পড়ে নষ্ট হয়। কিন্তু এর আগে ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই একসাথে এত তেল ফেলে দেওয়া হয়নি। কুয়েতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেলের ঘাঁটি 'সি-আইল্যান্ড'-এ স্টোরেজ ট্যাঙ্কটি বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়। সৌদি আরবের উপকূলে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রাণী যথা বৃহদাকার 'করমোর‍্যান্ট' ও 'স্কোটেরা' নামক দুই প্রজাতির পাখি ও সবুজ কচ্ছপ ডিম পাড়ে এবং নিয়মিত বসবাস করে। তারা আজ বিলুপ্তপ্রায়। দক্ষিণ কুয়েতের 'আল-মুসাল্লামিয়াহ' উপসাগরের তটভূমি কালো হয়ে ক্ষয়ে গেছে। এখানে জোয়ারের জলের সংগে কালো তেল ভাসতে ভাসতে বালিতে চলে আসে। বেলাভূমি তখন তেল আর বালিতে চট্ চট্ করে। হেলিকপ্টারে চড়ে আকাশ পথে পাড়ি দিলে আকাশেই খনিজতেলের ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়।

সমুদ্রের এক সুদীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে পড়ে থাকা এই তেল কি আর উদ্ধার করা সম্ভব! সৌদি আরবের বৃহত্তম তেল কোম্পানী 'সৌদি আরামকো' ও 'রয়্যাল কমিশন ফর দুবাইল অ্যান্ড ইয়ানবু' সংস্থা দুটি বর্তমানে সমুদ্র সাফাইয়ের কাজে নেমেছে। 'মেটিরিওলজিক্যাল এণ্ড এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা 'মেপো' তটরেখাগুলিকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত। এরা 'স্কিমারের' সাহায্যে অশোধিত তেল সমুদ্র থেকে ছেঁকে তোলে। এরপর 'ভ্যাকুয়াম ট্রাকের' সাহায্যে তা উপকূলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে 'ডিসপোজাল পিট'-এ তেল জমিয়ে রাখা হয় এবং পরে সময়মতো তা পরিশ্রুত করে নেওয়া হয়।

হিসাবমতো এভাবে দিনে ৩০,০০০ ব্যারেল তেল তোলা যেতে পারে। 'সৌদি আরামকো' সংস্থার ৩২০ জন কর্মী প্রতিদিন গড়ে ১৬,৫৯৯ ব্যারেল তেল তুলেছেন। তবে প্রকৃতিও এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। আদ্দাকি উপসাগরের আবু আলি দ্বীপটির ভৌগোলিক বাধার কারণে এর দক্ষিণ তটভাগ এখন তেলমুক্ত, যা 'আল দুবাইন' ও 'আদ-সাম্মামের' মতো শিল্পনগরীগুলি ভাসমান তেল থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।

যুদ্ধ ও পরিবেশ বিপর্যয়

সুশান্ত কুমার আশ (২য় বর্ষ)

পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মানুষ প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত কিন্তু বর্তমানে প্রকৃতি মানুষ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল আর পূর্বের অবস্থায় নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশের গুণাবলী ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশ এক চরম সংকটময় পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি উপসাগরীয় যুদ্ধের রূপ। পাশাপাশি ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বিধ্বংসী বিমান আক্রমণ; এবং তারই ফলস্বরূপ আফগানিস্তানের যুদ্ধের পরিস্থিতি। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্গহানি করার কাজ থেকে বিরত না হলে পৃথিবী অদূর ভবিষ্যতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের বাসযোগ্যতা হারাবে।

যুদ্ধের ফলে কোন একটি দেশের প্রাণ ও সম্পদের বিনাশের সংগে সংগে পৃথিবীব্যাপী পরিবেশের মান দ্রুত নেমে আসে। কেমনভাবে তা ঘটে দেখা যাক।

১) যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে যত সংখ্যায় মানুষ মারা যায় তার থেকে অনেক বেশি মানুষ বহুদিন পর্যন্ত মৃতের ন্যায় জীবন ধারণ করে।

২) বহুবছর পরেও যে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করে সেও এই যুদ্ধের ধ্বংসলীলার প্রভাব বহন করে। তাছাড়া আছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রতিবন্ধকতা; যেমন — রক্ত, হৃদযন্ত্রের ব্যাধি, মৃত শিশুর জন্ম, মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব, পোলিও ইত্যাদি।

৩) নানাপ্রকার চর্মরোগ, ক্যান্সার প্রভৃতি ভয়াবহ ব্যধির সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র মানুষই নয়, সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদকূলও যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। ফলস্বরূপ বন্যা, বনাঞ্চলে অগ্নিসংযোগ বা দাবানলের সৃষ্টি। এরফলে প্রাণীকূল বাসস্থানহীনতার জন্য বিলুপ্ত হয়।

৪) যুদ্ধ যে স্থানেই ঘটুক না কেন, পরিত্যক্ত ও নিক্ষিপ্ত পদার্থ জলভাগের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। এরফলে জলজ প্রাণী, ভৌমজলস্তর, সামুদ্রিক প্রাণী, যেমন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ব্যহত হয়। যার প্রভাব আমরা উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯১)লক্ষ্য করেছি এবং যা পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন ঋতুতে আগত বিভিন্ন প্রাণী ও পরিযায়ী পাখির সংখ্যাও হ্রাস পায়, যেমন— সাইবেরিয়ার সারস পাখি।

৫) জলবায়ুগত বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন যখন সারা বিশ্বে একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেইসময় এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে; যেমন— আবহমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, পাশাপাশি ওজোন স্তরের বিনাশ ও গ্রীনহাউস প্রভাব সৃষ্টি। এছাড়া উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি ও মেরু অঞ্চলে দ্রুত বরফ গলতে শুরু করেছে।

৬) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত পরিবর্তনই নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তথা সমগ্র বিশ্বের

অর্থনৈতিক অবনমন এক চরম আকার ধারণ করে। দেশের পরিকাঠামোগত ক্ষতি ও সামাজিক এবং শাসনতান্ত্রিক অস্থিরতা যুদ্ধের অপ্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে দেখা হয়।

৭) এছাড়া আছে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। নানাপ্রকার সামাজিক অবনমন; যেমন— দুষ্কৃতি সমস্যা, দারিদ্র, বেকারত্ব, অপুষ্টি, খাদ্যাভাব, দূর্ভিক্ষ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা ও অবক্ষয়গুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে উগ্রপন্থা, মৌল-জাতীয়তাবাদ, ধর্মবিদ্বেষ প্রভৃতির সংগে আক্রান্ত দেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে উদ্বাস্তু সমস্যা ব্যাপক আকারে দেখা যায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া যুদ্ধের একটি সামাজিক কু-প্রভাব হিসাবে দেখা যায়।

যুদ্ধের ফলে পরস্পর ও প্রতিপক্ষের মানসিকতা অনেকসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে নানাপ্রকার প্রাণনাশক জীবাণুর ব্যবহার করতেও তারা পিছপা হচ্ছে না। সাম্প্রতিক যুদ্ধে 'অ্যানথ্রাক্স'-এর জীবাণু প্রয়োগ বিশ্বব্যাপী ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, যা পশ্চিমী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে জীবানুযুদ্ধের আতঙ্ক। তবে মনুষ্যসৃষ্টই হোক বা প্রকৃতিসৃষ্টই হোক অ্যানথ্রাক্স একটি মারণব্যাধি যা বোমা গোলাবারুদ ছাড়াই একসাথে অল্পসময়ের মধ্যে অসংখ্য মানুষকে শেষ করে দিতে পারে।